হাবারমাস প্রসঙ্গে

কল্যাণ সেনগুপ্ত

হাবারমাসের কথা কিছু বলার আগে যে দার্শনিক আবহ থেকে তাঁর তত্ত্ব উঠে এসেছে সেই আবহের সঙ্গে আমাদের কিছু চেনাশোনার দরকার। জার্মান দেশে একটি দার্শনিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে হর্কহাইমার, অ্যাডোর্নো, হাবারমাস প্রমুখ বিদগ্ধজনেরা যার অন্যতম। এই সম্প্রদায়কে বলা হয় ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল। এই স্কুল যে তত্ত্বটি দিয়ে থাকে তার নাম ক্রিটিকাল থিয়োরি। এই তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রধানত তিনটি : (১) এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য মানুষের কর্মের সহায়ক হওয়া অর্থাৎ যে সব বিশ্বাস, সংস্কার বা কুসংস্কার মানুষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার যথার্থ কর্মের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে—সেই বিশ্বাস ও কুসংস্কার বিষয়ে তাকে আলোকিত করা এবং তা থেকে মুক্তি এনে দেওয়া। (২) এই তত্ত্ব কোনও প্রয়োগ-নিরপেক্ষ অবস্থানে বিশ্বাসী নয়। এর উদ্দেশ্য কর্মের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দেওয়া—যে জ্ঞানই মুক্তির উপায়। (৩) স্পষ্টতই এখানে এপিস্টেমোলজি কোনও নিরপেক্ষ ও বস্তুগত জ্ঞানকে প্রশ্রয় দেয়না এবং এখানেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে এর পার্থক্য। লজিকাল পজিটিভিস্টদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে জ্ঞানের ভর বস্তুনিষ্ঠা, ক্রিটিকাল তত্ত্বে জ্ঞানের ভর চিন্তা অথবা কর্মবিষয়ক চিন্তা। Raymond Geuss এর ভাষায়, 'One basic goal of the Frankfurt School is the criticism of logical positivism and the rehabilitation of reflection as a category of valid knowledge' (The Idea of a Critical Theory, পৃঃ ২)। তাহলে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ক্রিটিকাল তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই : 'A critical theory, then, is a reflective theory which gives agents a kind of knowledge inherently productive of enlightenment and emancipation' (Raymond Geuss, পৃঃ ২)। এই তত্ত্ব অনুসারে জ্ঞান বিমূর্ত ও বিশুদ্ধ কোনও ক্রিয়াকান্ড নয়, জীবন ও প্রয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই তত্ত্বে জ্ঞানের লক্ষ্য ফ্রুটফুল ইন্টারভেনশন বা ফলপ্রসূ হস্তক্ষেপ।

উপরের কথাগুলি আর একটু বিশদভাবে সাজানো যাক্। প্রথমেই আসে ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘরানার দার্শনিকদের সঙ্গে বিজ্ঞানপন্থী লজিকাল পজিটিভিস্টদের পার্থক্যের কথা। এই দুই সম্প্রদায়ের তত্ত্বের মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য আছে। তা এই—প্রথমত, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের তফাৎ। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের লক্ষ্য বহির্জগত বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান—যে জ্ঞান অধিগত হলে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে আমাদের সার্থক অভিযোজন সম্ভব হয়। ক্রিটিকাল তত্ত্বের লক্ষ্য চেতনা ও মুক্তি। নিজের মধ্যে লুকোনো বাধাগুলি সম্বন্ধে কর্তাকে সচেতন করা। এর ফলে ওই বাধা থেকে কর্তার মুক্তি ঘটে এবং সে বেছে নিতে পারে তার সঠিক কর্মপন্থা।

দ্বিতীয়ত, লজিকাল বা জ্ঞানীয় গঠনের তফাৎ। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বস্তুনিষ্ঠ। এখানে তত্ত্ব ও তার বিষয়ের মধ্যে একটি সীমারেখা সহজেই টানা যায়। ক্রিটিকাল তত্ত্ব চিন্তন-নির্ভর : এখানে

চিন্তা ও চিন্তার বিষয়, ভাবনা ও জীবন এক হয়ে যায়। এখানে ভাবনার অর্থই জীবন-ভাবনা; বীক্ষার অর্থই কর্ম আন্দোলিত জীবন-বীক্ষা।

তৃতীয়ত, কোন্‌টি জ্ঞানগতভাবে গ্রহণীয়, কোন্‌টি তা নয় তা নির্দ্ধারণ করার মানদণ্ড এই দুরকম তত্ত্বের এক নয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে জোর দেওয়া হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা-নির্ভর এম্‌পিরিকাল সমর্থনের উপর। ক্রিটিকাল তত্ত্ব এই এম্‌পিরিকাল সমর্থনে বিশ্বাসী নয়। এখানে কোন্‌টি জ্ঞানগতভাবে গ্রাহ্য হবে তা নির্ভর করে যুক্তি-নির্ভর পারস্পরিক ঐকমত্যের উপর।

উপরের আলোচনা থেকে হয়তো উঠে আসে ক্রিটিকাল তত্ত্বের স্বরূপ। এই তত্ত্ব বস্তুগত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়, সমাজ ও জীবন বিষয়ক তত্ত্ব। সামাজিক নানা আদানপ্রদান, ঘাত- প্রতিঘাত, সম্পর্কের নানা টানপোড়েন, জটিলতা—এই তত্ত্বের মূল কেন্দ্রবিন্দু। এই তত্ত্বটি এবার একটু আলোচনা করা যাক্।

যে কোনও সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পাই কিছু সামাজিক বিশ্বাস ও সংস্কার। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সমাজতত্ত্বে যেটি বিবেচ্য তা সামাজিক সংগঠনের একটি বস্তুগত নিরীক্ষা নয়, সমাজের অন্তর্গত মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কারের একটি রূপরেখা রচনা করা। অর্থাৎ এই সমাজতত্ত্ব নিছক সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের নিরপেক্ষ বিবরণ নয়, এই প্রতিষ্ঠান বা ক্রিয়াকলাপের প্রতি ব্যক্তির বিশ্বাস বা প্রতীতির মূল্যায়নও বটে। এই বিশ্বাস বা প্রতীতি কখনও কখনও সুষ্ঠু সামাজিক সম্পর্ক-রচনার প্রতিকূল হয়ে ওঠে। ফ্রাঙ্কফুর্টের সামাজিক তত্ত্ব সেই প্রতিবন্ধকতাকেই চেতনার পাদপ্রদীপে তুলে ধরতে চায়। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি যে পথে চলে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই :

(ক) প্রাথমিক স্তর : এই স্তরে নানা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এখানে আমাদের অস্তিত্ব মুক্ত নয়, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত।

(খ) এই প্রাথমিক স্তরে আমাদের অলীক চেতনা ও পরাধীন সত্তা পরস্পর মিলে মিশে থাকে।

(গ) অস্তিত্বের এই পরাধীনতা তখনই ঘটে যখন অন্ধবিশ্বাস ও মূল্যবোধ আমাদের রক্তের মধ্যে মিশে যায়, আমাদের ভিতরের এক নিহিত সত্য হয়ে ওঠে। আমাদের অলীক সত্তা এক ধরনের আত্ম-মরীচিকা বা আত্ম-সংকট।

(ঘ) শেষ স্তর : এই স্তরে অলীক চেতনা থেকে মুক্তি। এখানে আমরা অলীক বিশ্বাস সম্বন্ধে সচেতন হই এবং ভিতরের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হই।

উপরের স্তর-বিন্যাসটি আরও একটু বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা যায় এইভাবে। আমাদের পারস্পরিক স্বার্থ বিজড়িত যৌথকর্মে আমাদের দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে তার একটি পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত আমাদের সমাজ থেকেই আসে। আমাদের ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি, স্বার্থকে উপেক্ষা করে আমরা যে সেইসব মেনে নিই তার কারণ আমরা তাকে বৈধ বলে মনে করি। সে সিদ্ধান্তকে বৈধ বলে মনে করার কারণ তার পিছনে যে norm আছে তা আমাদের কাছে গ্রহণীয়। এই norm আমাদের কাছে গ্রহণীয় কারণ কোনও একটি সমাজে norm বিষয়ে বিশ্বাস এবং অন্যান্য বিশ্বাস মিলিয়ে জীবন ও জগতের যে চেতনা প্রচলিত থাকে এই norm সেখান থেকেই

আসে। কাজেই একটি সামাজিক প্রথা যদি repressiveও হয়, যদি তা আমাদের প্রবল ইচ্ছাকে প্রতিহত করে তাহলেও আমরা তাকে যে বৈধ বলে মেনে নিই—তার কারণ আমাদের জগত ও জীবন-চেতনা থেকে যে ঔচিত্যবোধ আসে সেটি সেই সামাজিক প্রথাকে সমর্থন করে। এবং আমাদের এই জগতচেতনা বিকৃত হলেও তা নিয়ে মুক্ত আলোচনা ও সমালোচনার দরজা খোলা থাকেনা। ফলে সামাজিক প্রথা repressive বা দমনমূলক হলেও আমরা বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিই। স্বেচ্ছায় তার দাসত্ব স্বীকার করি। ক্রিটিকাল তত্ত্বের কাজ এখান থেকেই শুরু। এই তত্ত্ব অনুসারে যেটি প্রধান বিবেচ্য তা হচ্ছে, যে প্রত্যয়, বিশ্বাস ও ঔচিত্যবোধ আমাদের ভিতরের জিনিষ হয়ে উঠেছে তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তার যথাযথ মূল্যায়ন। এর ফলে এই বিশ্বাস ও ঔচিত্যবোধের কাছে আমাদের অন্ধ দাসত্ব ধরা পড়ে আমাদেরই কাছে। আর এই সচেতনতা আমাদের অন্ধ দাসত্বের শিকড়কে আলগা করে দিয়ে মুক্তি এনে দেয় আমাদের।

ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘরানার এই তত্ত্বটি যদি আমরা মনে রাখি তবে তার পটভূমিকায় হাবারমাসের বক্তব্য বুঝতে সুবিধে হবে। হাবারমাস শুরু করেছেন ভাষা ও ভাববিনিময় থেকে। তার মতে, আমাদের সামাজিক আদান প্রদান, সম্পর্ক—সবই ভাষা-নির্ভর। আমাদের ভাব বিনিময়ের মধ্যে যদি কোনও বিকৃতি ঘটে তা হলে সামাজিক সম্পর্কও সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। কাজেই সামঞ্জস্যময় সমাজের জন্য প্রয়োজন যথার্থ ভাববিনিময়।

এবার ভাষা ও ভাববিনিময় বিষয়ে হাবারমাসের বক্তব্য কিছুটা বিশ্লেষণ করা যাক। জে. এল্. অস্টিন এবং জে. আর. শার্ল-এর মত তিনিও মনে করেন, ভাষা হচ্ছে ব্যবহার বা অ্যাক্ট। এই ভাষা ব্যবহার করেই আমরা কোনও কিছু সম্বন্ধে বলি, অনুরোধ করি, আদেশ করি, কোনটি করা উচিত কোনটি অনুচিত— তা প্রকাশ করি। এই ভাষার গঠনটি এইভাবে সাজানো যায় : আমি ..... (ক্রিয়া) ..... তুমি ..... যে (বাক্য)। এই গঠনটির দিকে নজর দিলে যে কথাগুলো উঠে আসে তা এই : আমি (বক্তা) তুমিকে (অর্থাৎ শ্রোতাকে) কোনও কিছু বিষয়ে বলে। যেমন, বলে যে সূর্য সকালে ওঠে। এ থেকে বোঝা যায়, ভাষা ব্যবহারের দুটি স্তর আছে। এক, আন্তর্ব্যক্তিক স্তর— যেখানে বক্তা ও শ্রোতা থাকে। দুই, বিষয়—যে বিষয়ে বক্তা শ্রোতাকে কিছু বলে। এই বিষয় বহির্জগতের বস্তু বা ঘটনা হতে পারে, বক্তার অন্তর্জগত অর্থাৎ তার বিশ্বাস, প্রত্যয় হতে পারে অথবা কোনটি উচিত বা অনুচিত সেই বক্তব্যও হতে পারে। এই আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক সুষ্ঠুভাবে রচিত হবার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। বক্তা যখন কোনও বিষয়ে শ্রোতার কাছে কিছু বলে তখন প্রথম শর্ত হচ্ছে, বক্তা যা বলবে সেটি শ্রোতার কাছে বোধগম্য হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত, বক্তা যখন কোনও বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে বলে, তখন সে যা বলছে তা যে সত্য সে বিষয়ে তাকে নিঃসংশয় হতে হবে। অথবা, বক্তা যদি তার বিশ্বাস বা প্রতীতি শ্রোতার কাছে পৌঁছে দিতে চায় তা হবে অকপট। কিংবা বক্তার বাক্যটি যদি বিধিবাক্য হয়, তবে সেখানে তাকে নিঃসংশয় হতে হবে, যে বিধির কথা সে বলছে তা বৈধ ও গ্রহণযোগ্য। সুষ্ঠু আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক রচিত হবে তখনই যখন শ্রোতার কাছে বক্তার বাক্য সুবোধ্য হবে, যখন সে বক্তা যা সত্য বলে মনে করছে তাকে সত্য বলে মেনে নেবে, বক্তার বিশ্বাস ও অভিপ্রায়কে অকপট বলে মেনে নেবে, অথবা বক্তার বিধিবাক্যকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করবে।

উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে, ভাষার প্রধান কাজ ভাব-বিনিময়। আমরা ভাষা ব্যবহার করি প্রধানত অপরের কাছে নিজেকে পৌঁছে দেবার জন্য—বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে অথবা বিধি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য। এ থেকে আরও ধরা পড়ে আমাদের এই ক্ষমতা তথা ভাববিনিময়ের দক্ষতা আছে। আর এখানেই চমস্কির সঙ্গে হাবারমাসের তফাৎ। ভাববিনিময়ের ক্ষমতা চমস্কি ভাষার প্রধান কাজ বলে মনে করেন না। তাঁর মনোযোগ ভাষার সিনট্যাক্স-এর দিকে। বাক্যগঠনের নিয়মাবলীই তাঁর প্রধান বিবেচ্য। কি করে একটি শুদ্ধ বাক্য গঠন করা যায়—কোন নিয়মে নিরন্তর শুদ্ধবাক্য গঠিত হয় তাঁর লক্ষ সেদিকে। এবং তিনি বলেন, বাক্যগঠনের এই নিয়মাবলী বক্তার মনের মধ্যেই থাকে। এই অর্থে শুদ্ধবাক্য ব্যবহারের ক্ষমতা বক্তার স্বভাবজাত। হাবারমাস অবশ্য চমস্কির এই অবস্থানে বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে, 'in order to participate in normal discourse, the speaker must have - in addition to his linguistic competence — basic qualifications of speech and of symbolic interaction at his disposal which we may call communicative competence' (Toward a theory of communicative competence', Recent Sociology, No.2, 1970, পৃঃ ১৩৮)। অর্থাৎ হাবারমাসের মতে, শুধু বিশুদ্ধ বাক্য তৈরি করার নিয়মগুলিই বক্তার আয়ত্তে নয়, সেই বিশুদ্ধ বাক্যগুলি ভাববিনিময়ের জন্য ব্যবহার করার ক্ষমতাও তার মধ্যে আছে।

বক্তার এই ভাববিনিময়ের ক্ষমতার ভর প্রত্যেক ভাষার মধ্যে নিহিত কতকগুলি উপাদান যা প্রমাণ করে ভাববিনিময় ভাষার কাঠামোর মধ্যেই আছে। এই উপাদানগুলিকে হাবারমাস বলেন প্র্যাগম্যাটিক ইউনিভার্সালস্। এই universals চমস্কির linguistic universals-এর আদলেই তৈরি হয়েছে। যদিও অন্যরকম ভাবে linguistic universals ভাষার আকারের মূল গড়ন। কিন্তু হাবারমাসের pragmatic universals ভাষার ভাববিনিময় ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত। তিনি বলেন : "without reference to these universals, we could not even define the recurrent components of possible speech, namely the expressions themselves, and then the interpersonal relations between speakers / hearers which are generated with the expression, and finally the objects about which the speakers / hearers communicate with one another" (J. B. Thompson এর 'Universal Pragmatics' থেকে নেওয়া, পৃঃ ৮)। এই ইউনিভার্সাল উপাদানগুলি এই :

১। ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ঃ 'আমি', 'তুমি' ইত্যাদি। দেশকাল নির্দেশক পদ, পদার্থবাচক সর্বনাম ঃ যেগুলো দিয়ে বক্তা ও শ্রোতার সঙ্গে বাইরের বস্তুর বা ঘটনার সংযোগ হয়।
২। ক্রিয়া বা performative verbs যা দিয়ে আমরা বর্ণনা করা, অনুরোধ করা, আদেশ করা, কোনটি করা উচিত, কোনটি নয় ইত্যাদি কাজগুলি করে থাকি। এই উপাদানগুলি বক্তার আয়ত্তে আছে বলেই বক্তার ভাববিনিময় ক্ষমতা আছে।

এই ভাববিনিময় যদি সুষ্ঠু না হয় তাহলে ব্যাহত হবে পারস্পরিক সম্পর্কের সামঞ্জস্য। তৈরি হবেনা সুন্দর সমাজ। কিন্তু বাস্তবে ভাব বিনিময় অনেক সময়েই বিকৃত হয়ে যায়। এই বিকৃতি ঘটে নানা কারণে। প্রধান কারণ আইডিওলজিকাল। অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনে কোনও বিচার না করেই অন্ধভাবে সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও প্রথা মেনে নেওয়া। এই বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও প্রথাগুলি আমাদের এমন আত্মস্থ স্বভাবজাত হয়ে যায় যে এর পেছনে ক্ষমতার অবদান

আমাদের চোখে পড়ে না। যেমন ধরা যাক, আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কথা। ভাষা এই সমাজের প্রতিবিম্ব বলেই এই ভাষার মধ্য দিয়ে যে প্রত্যয়, মূল্যবোধ আমরা সহজাতভাবে আত্মস্থ করি সেগুলো পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার দ্বারা নির্দ্ধারিত। ফলে নারী সমাজও এই বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অধীন হয় ভাষার মধ্য দিয়ে। সুতরাং এই ভাষা বুঝতে তাদের অসুবিধে হয়না এবং মেনে নিতেও দ্বিধা হয়না। কাজেই ভাববিনিময় হয় বটে কিন্তু তা বিকৃত। কারণ এই ভাষা ও ভাববিনিময় প্রকৃতপক্ষে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য রচনা করে। অতএব প্রয়োজন বিচারমূলক দৃষ্টি : যে বিশ্বাস, মূল্য ও প্রথা আমরা মেনে নিয়েছি তার সম্পর্কে আলোচনা। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা সার্থক হয়না যদি প্রত্যেকের সমান সুযোগ না থাকে। এই আলোচনার প্রধান শর্ত বাইরের বা ভিতরের চাপ থেকে মুক্ত থাকা। এই আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সদর্থকভাবে কোনও বিষয়ে সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে আসা। শুধুমাত্র যুক্তির মারফৎ এই ঐকমত্যে পৌঁছোনো যায়। যুক্তিই একমাত্র হাতিয়ার যা সামাজিক বৈষম্য দূর করতে পারে। পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে পারে। যুক্তি-নির্ভর মুক্ত আলোচনাই একমাত্র আমাদের সমস্ত প্রতিকূল সংস্কার থেকে মুক্তি এনে দিতে পারে। সুতরাং হাবারমাস যে বাসনায় উদ্বুদ্ধ তা হচ্ছে রিচার্ড রর্টির ভাষায়, 'the desire for communication, harmony, interchange, conversation, social solidarity and the "merely" beautiful' (Philosophical Papers, vol. 2, পৃ. ১২৬)।

কিন্তু হাবারমাসের প্রধান ত্রুটি বোধ হয় তত্ত্বে বিশেষ আস্থা স্থাপন। ক্ষমতার প্রভুত্ব এবং আইডিওলজি ইত্যাদি বিভিন্ন অসামঞ্জস্য — যা আমাদের সামাজিক সম্পর্ক বিপন্ন করে তোলে তাকে খুঁজে বার করবার জন্য তত্ত্ব কি সত্যিই অপরিহার্য? কারণ এই অশুভ বা প্রতিকূল শক্তিগুলি এতই জটিল ও প্রসঙ্গ-সাপেক্ষ যে কোনও সাধারণ তত্ত্ব দিয়ে তাদের ধরা যায়না। এদের ধরতে গেলে কোনও নির্বিশেষ তত্ত্ব দিয়ে নয়, বিশেষ মনোযোগী দৃষ্টি দিতে হবে এদেরই দিকে। হ্বিটগেনস্টাইনের ভাষায়, আমাদের আদর্শ হবে : 'Don't think, but look'। দেখতে হবে বাস্তবে এরা কোনও প্রসঙ্গে কীভাবে কাজ করে, এবং সে অনুযায়ী কোন কৌশল অবলম্বন করলে এদের প্রতিহত করে সামাজিক ঐক্যের পথ উন্মুক্ত করা যাবে। কিন্তু এটি কোনও চিন্তা বা theoretical reflection এর ব্যাপার নয়, এটি সম্পূর্ণ practical engagement -এর ব্যাপার।